অপুর সঙ্গে আড়াই বছর

পথের পাঁচালী ছবি তোলার কাজ চলেছিল আড়াই বছর ধরে। অবিশ্যি এই আড়াই বছরের রোজই যে শুটিং হয়েছে তা নয়। আমি তখন বিজ্ঞাপনের আপিসে কাজ করি। এই কাজের ফাঁকে ফাঁকেই শুটিং হত। আর তা অধিকাংশই হত ছুটির দিনে বা আপিসের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে। পয়সাকড়ি বেশি ছিল না আমাদের। যেটুকু জোগাড় হত সেটা ফুরিয়ে গেলে কাজ বন্ধ করে বসে থাকতে হত যত দিন না আবার কিছু টাকা জোগাড় হয় তার অপেক্ষায়।

শুটিং হবার আগে অভিনয় করার জন্য লোক জোগাড়ের একটা বড় পর্ব ছিল। বিশেষ করে অপুর জন্য কিছুতেই একটি বছর ছয়েকের ছেলে পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষে বাধ্য হয়ে আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিই।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর একটা বাড়িতে একটা ঘর নিয়েছিলাম; সেই ঘরে রোজ বিকেলে একটা নির্দিষ্ট সময় সব ছেলে এসে হাজির হত। অনেক ছেলেই এসেছিল, কিন্তু মনের মতো একটিও নয়। একদিন একটি ছেলে এল, তার ঘাড়ে পাউডার লেগে আছে দেখে আমার কেমন জানি সন্দেহ হল। তার নাম জিগ্যেস করতে ছেলেটি মিহিগলায় বলল, 'টিয়া'। সঙ্গের অভিভাবককে জিগ্যেস করলাম, 'একে কি সদ্য সেলুন থেকে চুল ছাঁটিয়ে আনলেন নাকি?' ভদ্রলোক ধরা পড়ে গিয়ে আর আসল ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। বললেন ছেলেটি আসলে মেয়ে, অপুর পার্ট পাবার লোভে তাকে চুল ছাঁটিয়ে এনেছেন আমাদের কাছে।

বিজ্ঞাপন দিয়ে ছেলে না পাওয়ার ফলে আমাদের প্রায় হাল ছেড়ে দেওয়ার অবস্থা হয়েছিল। শেষে আমার স্ত্রী একদিন ছাত থেকে নেমে

এসে বললেন, 'পাশের বাড়ির ছাতে একটি ছেলেকে দেখলাম ; তাকে একবার ডেকে পাঠাও তো।' এই পাশের বাড়ির ছেলে শ্রীমান সুবীর ব্যানার্জিই শেষে হল আমাদের অপু। ছবির কাজ যে আড়াই বছর ধরে চলবে সে তো গোড়ায় ভাবা যায়নি, শেষে যত দিন যায় ততই ভয় হয় অপু-দুর্গা যদি বেশি বড় হয়ে যায় তা হলে ছবিতে সেটা ধরা পড়বে। কিন্তু ভাগ্য ভাল যে এই বয়সে যতটা বাড়ার কথা, দু'জনের একজনও ততটা বাড়েনি। আশি বছরের বুড়ি চুনিবালা দেবী—যিনি ইন্দিরা ঠাকরুন সেজেছিলেন তিনিও যে শুটিং-এর এত ধকল সত্ত্বেও আড়াই বছর বেঁচেছিলেন, সেটাও আমাদের পরম সৌভাগ্য।

শুটিং-এর একেবারে শুরুতেই হল গোলমাল। অপু-দুর্গাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কলকাতা থেকে সত্তর মাইল দূরে বর্ধমানের কাছে পালসিট বলে একটা জায়গায়। সেখানে রেললাইনের ধারে কাশফুলে ভরা মাঠ। অপু-দুর্গার প্রথম ট্রেন দেখার দৃশ্য তোলা হবে। বেশ বড় দৃশ্য, তাই একদিনে কাজ শেষ হবে না, অন্তত দু'দিন লাগবে। প্রথম দিন ছিল জগদ্ধাত্রী পুজো। অপু-দুর্গার মধ্যে মন কষাকষি চলেছে, দিদির পিছনে ধাওয়া করে অপু গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে পৌঁছেছে কাশবনে। সকাল থেকে শুরু করে বিকেল অবধি কাজ করে প্রায় অর্ধেক দৃশ্য তোলা হল। পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, খুদে অভিনেতা-অভিনেত্রী সকলেই নতুন, সকলেরই একটু বাধোবাধো ঠেকছে। তবে উৎসাহের অভাব নেই কারুর। প্রথম দিনের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে দিন সাতেক পরে আবার সেই একই জায়গায় ফিরে গিয়ে মনে হল—এ কোথায় এলাম ? কোথায় গেল সব কাশ ? দৃশ্য যে প্রায় চেনাই যায় না ! স্থানীয় লোকের কাছে জানা গেল কাশফুল নাকি গরুর খাদ্য। এই সাত দিনে সব কাশ খেয়ে গেছে তারা। এখন যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে জায়গাটা সেখানে ছবি তুললে আর প্রথম দিনের ছবির সঙ্গে মিলবে না।

এ দৃশ্যের বাকি অংশ তোলা হয়েছিল পরের বছরের শরৎ কালে, যখন আবার নতুন কাশে মাঠ ভরে গেছে। এবার অবিশ্যি ট্রেনের শট্‌ও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ট্রেন নিয়ে এতগুলো শট্ ছিল যে একটা ট্রেনে কাজ হয়নি। পর পর তিনটে ট্রেন ব্যবহার করা হয়েছিল। আগে থেকে টাইম টেব্‌ল দেখে জেনে নেওয়া হয়েছিল সকাল থেকে বিকেলের মধ্যে ক'টা ট্রেন এই লাইনে আসে। প্রত্যেকটি ট্রেন অবিশ্যি একই দিক থেকে আসা চাই—উল্‌টোমুখি ট্রেন হলে চলবে না। যে স্টেশন থেকে ট্রেন আসবে সেখানে আমাদের দলের অনিলবাবুকে রাখা হয়েছিল। ট্রেন এলে অনিলবাবু উঠে পড়তেন। এঞ্জিনে ড্রাইভারের সঙ্গে। কারণ গাড়ি শুটিং-এর জায়গার কাছাকাছি এলেই বয়লারে কয়লা দেওয়া দরকার, তা না হলে কালো ধোঁয়া বেরোবে না। সাদা কাশ ফুলের পাশে কালো

ধোঁয়া না পেলে দৃশ্য জমবে কেন ?

ফিল্মে যখন দৃশ্যটা দেখা যায় তখন বোঝাই যায় না যে দিনের তিনটে বিভিন্ন সময় তিনটে আলাদা ট্রেন ব্যবহার করা হয়েছে। আজকের ডিজেল-ইলেকট্রিকের যুগে অবিশ্যি এ দৃশ্য এভাবে তোলা যেত না।

পয়সার অভাবে এত বেশি দিন ধরে ছবি তোলার জন্য আরও অনেক সমস্যার সামনে পড়তে হয়েছিল আমাদের। একটা উদাহরণ দিই।

বইয়ে আছে অপু-দুর্গাদের পোষা কুকুর ভুলোর কথা। গ্রাম থেকেই একটা কুকুর জোগাড় হয়েছিল ; সেটা আমাদের সকলেরই বেশ পোষ মেনে গিয়েছিল। ছবির একটা দৃশ্যে অপুর মা সর্বজয়া অপুকে ভাত খাওয়াচ্ছেন। ভুলো দাওয়ার সামনে উঠোনে বসে খাওয়া দেখছে। অপুর হাতে তীর ধনুক, খাওয়ায় তার বিশেষ মন নেই। সে মার দিকে পিঠ করে বসেছে, কখন আবার তীর ধনুক নিয়ে খেলবে তারই অপেক্ষা।

অপু খেতে খেতেই তীর ছোঁড়ে। তারপর খাওয়া ছেড়ে উঠে যায় তীর আনতে। সর্বজয়া বাঁ হাতে থালা ডান হাতে গ্রাস নিয়ে ছেলের পিছনে ধাওয়া করে। কিন্তু ছেলের ভাব দেখে বোঝে সে আর খাবে না। ভুলোও উঠে পড়েছে। তার লক্ষ ভাতের থালার দিকে।

এর পরের শট্-এ দেখানো হবে সর্বজয়া বাকি ভাতটুকু আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়। আর সেটা যায় ভুলোর পেটে। কিন্তু এই শট্‌টা আর নেওয়া গেল না। দিনের আলো ফুরিয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে আমাদের টাকাও।

মাস ছয়েক পরে টাকা সংগ্রহ হলে পর আবার বোড়াল গ্রামে যাওয়া হয় দৃশ্যের বাকি অংশ তোলার জন্য। কিন্তু গিয়ে জানা গেল ভুলো আর নেই। এই ছ'মাসের মধ্যে সে কুকুর মরে গেছে। কী হবে ?

খবর পাওয়া গেল আর একটা কুকুর আছে অনেকটা ভুলোর মতোই দেখতে। আনো ধরে সে কুকুরকে।

সত্যি তো। দুই কুকুরে আশ্চর্য মিল। গায়ের বাদামি রঙে তো বটেই। সেই সঙ্গে আগেরটার মতো এটারও ল্যাজের ডগা সাদা। শেষ পর্যন্ত এই নকল ভুলোই সর্বজয়ার পিছন পিছন এসে দিব্যি আস্তাকুঁড়ে ফেলা থালার ভাত খেয়ে ফেলল, আর আমাদেরও পুরো দৃশ্যটা তোলা হয়ে গেল। ফিল্ম দেখে ফাঁকি ধরে কার সাধ্যি।

শুধু কুকুর কেন, মানুষকে নিয়েও ঠিক এই মুশকিলে পড়তে হয়েছিল পথের পাঁচালীর শুটিং-এ।

চিনিবাস ময়রার কাছ থেকে মিষ্টি কেনার সামর্থ্য অপু-দুর্গার নেই। তাই ময়রার পিছন ধাওয়া করে তারা যায় মুখুজ্যেদের বাড়িতে। মুখুজ্যেরা বড়লোক, তারা মিষ্টি কিনবেই, আর তাই দেখেই অপু-দুর্গার

আনন্দ।

এই দৃশ্যও খানিক দূর তোলার পর আমাদের শুটিং বেশ কয়েকমাসের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। টাকা জোগাড় হলে পর আবার যখন আমরা গ্রামে যাব তখন খবর এল যিনি চিনিবাসের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি আর এই জগতে নেই! কুকুরে-কুকুরে সামান্য বেমিল ধরা না গেলেও প্রথম চিনিবাসের সঙ্গে মোটামুটি মিল হবে এমন মানুষ পাই কোথায়?

শেষ পর্যন্ত যাঁকে পাওয়া গেল তাঁর মুখে বিশেষ মিল না থাকলেও, দেহটা মোটামুটি আগের চিনিবাসের মতোই নাদুস নুদুস। তাঁকে নিয়েই শট্ নেওয়া হল। ছবিতে দেখা গেল এক নম্বর চিনিবাস বাঁশ বন থেকে বেরোলেন, আর পরের শটেই দু' নম্বর চিনিবাস ক্যামেরার দিকে পিঠ করে মুখুজ্যেদের বাড়ির ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। পথের পাঁচালী ছবি অনেকে একাধিকবার দেখেছে। কিন্তু কেউ কোনওদিন আমাদের ফাঁকি ধরতে পেরেছে বলে শুনিনি।

এই চিনিবাসের দৃশ্যেই একটা ব্যাপারে আমাদের খুব নাজেহাল হতে হয়েছিল। আর সেটা ওই ভুলো কুকুরকে নিয়ে। পুকুরের ওপারে ময়রা দাঁড়িয়ে আছে। আর এপারে বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে অপু-দুর্গা তার দিকে চেয়ে আছে লোলুপ দৃষ্টিতে। ময়রার প্রশ্নের জবাবে তারা জানায়, তাদের মিষ্টির দরকার নেই। ময়রা তখন রওনা দেয় মুখুজ্যেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। দুর্গা অপুকে বলে, 'চ', আমরাও যাই'। ভাই বোনে ছুট দেয়। আর ঠিক তখনই পিছনে গাছতলায় বসা ভুলো একলাফে উঠে ছুট দেয় তাদের সঙ্গে যাবার জন্য।

এই হল দৃশ্য ; কিন্তু মুশকিল হল কী? এ কুকুর তো আর হলিউডের শেখানো পড়ানো তৈরি কুকুর নয়—কাজেই ঠিক অপু-দুর্গার সঙ্গে সঙ্গে সেও দৌড় দেবে কিনা এটা বলা ভারি কঠিন। কুকুরের আসল মালিককে বলা আছে, যেই অপু-দুর্গা দৌড় দেবে, তৎক্ষণাৎ ক্যামেরার পিছন থেকে তিনি যেন কুকুরের নাম ধরে ডাক দেন, যাতে সেও দৌড়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল কুকুর ডাকে সাড়া দেয় না। যেমন ছিল তেমনই বসে থাকে। এদিকে ক্যামেরা চলছে, ফিল্মের দাম অনেক, সেই ফিল্ম নষ্ট হচ্ছে, আর আমাকে বার বার বলতে হচ্ছে 'কাট্! কাট্!'

এখানে ধৈর্য ধরা ছাড়া গতি নেই। ঠিক ভাবে ঠিক সময়ে ছুট দিলে ভুলো সত্যি হয়ে যাবে এদের পোষা কুকুর, মিষ্টির প্রতি যার লোভ তার মনিবদের চেয়ে কিছু কম নয়।

এই পয়সার অভাবেই আমাদের বৃষ্টির দৃশ্য তুলতে প্রচণ্ড অসুবিধা হয়েছিল। বর্ষাকাল এল গেল, অথচ আমাদের হাত খালি বলে শুটিং বন্ধ। শেষটায় যখন পয়সা এল তখন অক্টোবর মাস। শরৎকালে

ঝলমলে দিনে বৃষ্টির আশায় অপু-দুর্গা যন্ত্রপাতি লোকজন নিয়ে রোজ গিয়ে গ্রামে বসে থাকতাম। আকাশে একটুকরো কালো মেঘ দেখলেই হাঁ করে সেদিকে চেয়ে থাকতাম, যদি সেটা জাদুবলে আকাশ ছেয়ে ফেলে বৃষ্টি নামিয়ে দেয়।

শেষে একদিন তাই হল। শরৎকালে ঘনঘটা করে নামল তুমুল বৃষ্টি। তারই মধ্যে দুর্গা বৃষ্টিতে ভিজে দৌড়ে এসে কুলগাছতলায় ভাইয়ের পাশে আশ্রয় নিল। ভাইবোনে জড়াজড়ি করে বসে আছে। দুর্গা বিড়বিড় করছে 'নেবুর পাতা করমচা, হে বৃষ্টি ধরে যা'। শরৎকালের বৃষ্টিতে রীতিমতো ঠাণ্ডা, অপুর খালি গা, অ্যালক্যাথিনের ছাউনিতে ঢাকা ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে দেখছি সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। শট্-এর পরে দুধের সঙ্গে ব্র্যান্ডি খাইয়ে ভাই বোনের শরীর গরম করা হল। অবিশ্যি দৃশ্যটা যে ভালই হয়েছিল সেটা যারা ছবিটা দেখেছে তারাই জানে।

কাজের পক্ষে কিন্তু গোপালনগরের চেয়ে বোড়াল গ্রামকে আমাদের বেশি উপযোগী বলে মনে হল। অপু-দুর্গার বাড়ি, অপুর পাঠশালা, গ্রামের মাঠঘাট ডোবা পুকুর আমবন বাঁশবন সবই বোড়ালের মধ্যে বা আশেপাশে পাওয়া গিয়েছিল। এখন সে গ্রামে বিজলি এসে গেছে। পাকা বাড়ি পাকা রাস্তা হয়েছে। তখন সেরকম ছিল না।

এই গ্রামে আমাদের বহুদিন ধরে বহুবার যেতে হয়েছে তাই সেখানকার লোকজনের সঙ্গেও যথেষ্ট আলাপ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ভারি অদ্ভুত চরিত্র। এঁকে আমরা সুবোধদা বলে ডাকতাম। বছর ষাট-পঁয়ষট্টি বয়স, মাথায় টাক, একা একটি কুঁড়েঘরে থাকেন আর দাওয়ায় বসে আপন মনে বিড়বিড় করেন। আমরা ফিল্ম তুলতে এসেছি জেনে প্রথম দিকে তিনি মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। আমাদের দেখলেই হাঁক দিতেন—'ফিলমের দল এয়েচে—বল্লম নিয়ে লাপিয়ে পড়ো!' খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম এঁর মাথায় ছিট আছে। পরে অবিশ্যি সুবোধদার সঙ্গে আমাদের বেশ আলাপ হয়ে যায়। আমাদের ডেকে দাওয়ায় বসিয়ে বেহালায় যাত্রার গৎ বাজিয়ে শোনাতেন। আর মাঝে মাঝে কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বলতেন, 'ওই যে দেখছ সাইকেলে যাচ্ছে, ও কে জান তো? ও হল রুজভেল্ট। মহা পাজি।' আর একজন হল চার্চিল, আর একজন হিটলার, আর একজন খান আবদুল গফুর খাঁ। সকলেই পাজি, সকলেই সুবোধদার শত্রু।

আমরা যে বাড়িতে শুটিং করতাম, তার পাশের বাড়িতেই এক ধোপা থাকতেন। তিনিও ছিটগ্রস্ত। তাঁকে নিয়ে আমাদের মুশকিলই হত, কারণ তাঁর বাতিক ছিল হঠাৎ হঠাৎ 'হে বন্ধুগণ' বলে তারপরে দীর্ঘ রাজনৈতিক বক্তৃতা শুরু করা। অন্য সময়ে আপত্তি নেই, কিন্তু শট্-এর মাঝখানে এই বক্তৃতা শুরু হলে আমাদের সাউন্ডের দফারফা হয়ে যাবে।

তাঁর বাড়ির লোকেরা এ ব্যাপারে সাহায্য না করলে আমাদের সমস্যা সমস্যাই থেকে যেত।

যে বাড়িতে শুটিং হত সেটা আমরা পেয়েছিলাম জীর্ণ জংলা অবস্থায়। বাড়ির মালিক থাকতেন কলকাতায়। তাঁর কাছ থেকে মাসিক ভাড়া দিয়ে বাড়িটা আমরা ব্যবহারের জন্য নিয়ে নিয়েছিলাম। সেটাকে সংস্কার করে আমাদের কাজের উপযোগী করে নিতে আমাদের লেগেছিল প্রায় এক মাস।

বাড়ির একটা অংশে সার বাঁধা পাশাপাশি কয়েকটা ঘর ছিল যেগুলো আমরা ছবিতে দেখাইনি। সেগুলিতে আমাদের মালপত্র রাখা হত। আর একটা ঘরে তাঁর যন্ত্র সমেত বসতেন আমাদের সাউন্ড রেকর্ডিস্ট ভূপেনবাবু। তাঁকে আমরা দেখতে না পেলেও, তাঁর গলা শুনতে পেতাম। প্রত্যেকটি শটের পর আমরা হাঁক দিয়ে জিগ্যেস করতাম, 'সাউন্ড ঠিক আছে তো ?' ভূপেনবাবু জবাবে হাঁ কি না জানিয়ে দিতেন।

একদিন একটা শট্-এর পর যথারীতি প্রশ্ন করাতে কোনও জবাব পেলাম না। আবার জিগ্যেস করলাম—'সাউন্ড ঠিক আছে তো ভূপেনবাবু ?' এবারও কোনও উত্তর না পেয়ে কারণটা জানার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি একটি বিরাট গোখরো সাপ ঘরের পিছন দিকের জানালা দিয়ে ঢুকে মেঝেতে নামছে। সেই সাপ দেখে স্বভাবতই ভূপেনবাবুর কথা বন্ধ হয়ে গেছে!

এই সাপটা আমরা আসার কয়েকদিনের মধ্যেই দেখেছিলাম। ইচ্ছে সত্ত্বেও স্থানীয় লোকে নিষেধ করাতে সেটাকে মারতে পারিনি। সাপটা নাকি বাস্তুসাপ। বহুদিন থেকেই এই পোড়ো বাড়িতে বসবাস করছে।